।। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা ।।

উপন্যাসের নামকরণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকেরা সাধারণতঃ কয়েকটি পন্থা অনুসরণ ক'রে থাকেন। যেমন—

(ক) নায়ক অথবা নায়িকার নামে নামকরণ। যথা—বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস', 'বিপ্রদাস' ইত্যাদি উপন্যাসের নামকরণ।

(খ) উদ্দেশ্যমূলক ব্যঞ্জনাগর্ভ নামকরণ। যেমন—বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', অথবা 'কৃষ্ণকান্তের উইল', রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' কিংবা 'শেষের কবিতা', শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা' অথবা 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতি উপন্যাস এশ্রেণীর উদাহরণ।

(গ) ঘটনামূলক নামকরণ। যথা—রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' অথবা তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' উপন্যাসদ্বয়।

(ঘ) স্থানাশ্রয়ী নামকরণ। যথা—তারাশঙ্করের 'কালিন্দী', 'হাঁসুলী বাঁকের

Scanned with CamScanner

উপকথা', অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ' অথবা 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', শঙ্করের 'চৌরঙ্গী', অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড' প্রভৃতি উপন্যাস।

(ঙ) আঙ্গিকনির্ভর নামকরণ। যথা—রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' কিংবা 'চার অধ্যায়' উপন্যাসদ্বয়। চারটি অঙ্গ সমন্বিত অথবা চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত বলেই এজাতীয় নামকরণ করা হয়েছে।

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের নামকরণে দ্বিতীয় রীতিটি অনুসৃত। অর্থাৎ উদ্দেশ্যমূলক ব্যঞ্জনাগর্ভ এ নামকরণ। ঔপন্যাসিক তাঁর মূল অভিপ্রায়টিকে সাংকেতিক ভাষায় এই নামকরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন।

'পথের পাঁচালী' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো পথের সংগীত। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে পাঁচালী জাতীয় কাব্য লেখার রেওয়াজ ছিলো। এই জাতীয় কাব্যগুলি প্রধানত কোনো দেবতার অথবা দেবীর মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হতো। 'পথের পাঁচালী' নামকরণের মধ্যেও এধরণের একটি ইঙ্গিত আছে। 'পথের পাঁচালী' হলো চির-চলিষ্ণু জীবনের অধিষ্ঠাতা পথিক-দেবতার বন্দনাগীতি। এ দেবতা পথের দেবতা। তিনি যার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করেন, তার জীবনে পথের টান প্রবল হয়ে ওঠে। পথের গান তার পথ চলার মন্ত্র হয়ে দেখা দেয়। আলোচ্য উপন্যাসে বলা হয়েছে মানুষের চিরন্তন পথিকবৃত্তির কথা। সে মানুষ চিরপথিক। নিত্যকাল সে পথ চলে। পথ তাকে প্রতিনিয়ত টানে। জন্ম-জন্মান্তরের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে পথিক মানবাত্মার সেই পথ-পরিক্রমণ। পল্লীবাংলার লোকসমাজের জন্য মধ্যযুগীয় কবিরা লিখতেন পাঁচালী কাব্য। সহজ সরল ছন্দ ও সুরে সে কাব্য রচিত হতো। বিংশ শতাব্দীর বাংলায় আবির্ভূত বিভূতিভূষণ যে গদ্যকাব্য 'পথের পাঁচালী' লিখলেন তার ছন্দ ও সুরও অত্যন্ত সহজ সরল।

পথের কথা, পথের অধিষ্ঠাতা দেবতার কথা, পথের আকর্ষণের কথা এ উপন্যাসে বারংবার এসেছে। নানা প্রসঙ্গে, বিভিন্ন চরিত্রকে ঘিরেই এই পথ ও পথের দেবতার কথা তুলেছেন লেখক। এরই সমর্থনে মূল উপন্যাস থেকে এ জাতীয় কয়েকটি অংশ উদ্ধার করা হলো—

(১) "এক হিসেবে এই রাত্রি তাহার কাছে বড় রহস্যময় ঠেকিতেছিল, সম্মুখে তাহাদের নবজীবনের যে পথ বিস্তীর্ণ ভবিষ্যতে চলিয়া গেছে—আজ রাতটি হইতেই তাহার শুরু। কে জানে সে জীবন কেমন হইবে! কে জানে জীবন-লক্ষ্মী কোন্ সাজি সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাহাদের সে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পাথেয়-রূপে?" (চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ হরিহরের ভাবনা)।

(২) "ইন্দির ঠাকরুণ ফিরিয়া আসিয়াছে ছয় সাত মাস হইল, সর্বজয়া কিন্তু ইহার মধ্যে একদিনও বুড়ির সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই।...দু'বেলা কথায় কথায় বুড়ীকে সময় থাকিতে পথ দেখিবার উপদেশ ইঙ্গিতে জানাইয়া দেয়। সে পথ কোন্ দিকে—জ্ঞান হইয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত সত্তর বৎসরের মধ্যে বুড়ী তাহার সন্ধান পায় নাই, এতকাল পরে কোথায় তাহা মিলিবে, ভাবিয়াই সে ঠাহর পায় না।" (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

(৩) "...হঠাৎ এক একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিয়া

Scanned with CamScanner

(৮) "আর এক কথা তাহার বার বার মনে হইতেছিল। এই তো সে বড় হইয়াছে, আর ছোট নাই, ছোট থাকিলে কি আর মা একা কোথায়ও ছাড়িয়া দিত?...এখন কেবলই চলা, কেবলই সামনে আগাইয়া যাওয়া। তাহা ছাড়া, আস্‌ছে মাসের এই দিনটিতে তাহার কতদূর, কোথায় চলিয়া যাইবে! কোথায় সেই কাশী—সেখানে!" (ঐ)।

(৯) "গ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজয়ার মনে হইল! যা কিছু দারিদ্র্য, যা কিছু হীনতা, যা কিছু অপমান সব রহিল পিছনে পড়িয়া—এখন সাম্‌নে শুধু নতুন সংসার, নতুন জীবনযাত্রা, নব সচ্ছলতা।" (অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ গ্রামত্যাগর প্রাক্কালে)।

(১০) "পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয় নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরুরায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়। তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়া, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে শুধুই সামনে...দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্য্যোদয় ছেড়ে সূর্য্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে...

দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চ'লে যায়...তোমাদের মর্ম্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভ'রে আসে, পথ আমার তখনও ফুরোয় না,...চলে...চলে...চলে...এগিয়েই চলে...

অনির্ব্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্তকাল অনন্ত আকাশ...

সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া ক'রে এনেছি!...চল যাই এগিয়ে যাই।" (চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

প্রথম উদ্ধৃতিতে আছে পথের আহ্বান হরিহরের জীবনে কিভাবে দেখা দিয়েছিলো তার ইঙ্গিত। হরিহরের রক্তের মধ্যেই পথ চলার একটা নেশা আছে, যে নেশা জন্মসূত্রে অপু লাভ করেছে। হরিহরের স্বভাব গৃহীর নয়, পথিকের। ঘরের তুলনায় পথের টানই তার কাছে অধিক। তাই দেখা গেল, যখন সে পরিপূর্ণ গৃহী হতে চেয়ে কাশীতে বাসা নিয়েছি, তখনই অত্যন্ত আকস্মিকভাবে মৃত্যু এসে তাকে ইহজগৎ থেকেই ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। অনন্তের আহ্বান এসে পৌঁছেছে তার জীবনে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি ইন্দির ঠাকরুণ সম্পর্কিত। নিষ্ঠুর কৌলিন্য প্রথার বলি হয়েছেন ইন্দির ঠাকরুণ। বহুপত্নীক কুলীন স্বামীর আগমন প্রত্যাশায় পথ চেয়ে চেয়ে তাঁর প্রথম যৌবনের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে। স্বামীর ঘরে এই কুলীন কন্যার আশ্রয় জোটেনি। প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় গলগ্রহের মতো আশ্রয়ের সন্ধানে তিনি তাঁর সত্তর বছরের জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। শান্তি, সুখ, নিশ্চিন্তির সন্ধানে তিনি আজীবন ঘুরে বেড়িয়েছেন, কিন্তু পরিণামে শুধু হতাশারই অধিকারিণী হয়েছেন।

তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম উদ্ধৃতিতে পথ-পাগল, স্বভাব-পথিক অপুর কথা বলা হয়েছে। অপুই 'পথের পাঁচালী'র নায়ক। চিরন্তন পথ চলার নেশা তার রক্তে। পথের অধিষ্ঠাতা দেবতার সে ভক্ত-শিষ্য। অপুকে তিনি আকাশের মাধ্যমে, গ্রাম্য গাছপালা ফলফুলের মাধ্যমে, উজ্জ্বল রোদ্দুর ও স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মাধ্যমে ঘরছাড়ার হাত ছানি দিয়েছেন। দশম উদ্ধৃতিতে পথের দেবতার সেই আহ্বানের কথা জ্ঞাপিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

পঞ্চম উদ্ধৃতিতে দুর্গার মৃত্যুকে উপলক্ষ ক'রে লেখক 'অনন্তের হাতছানি' ও 'সর্ব্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক'-এর কথা জানিয়েছেন। দুর্গার মৃত্যু পাঠকচিত্তে যত বেদনাই সৃষ্টি করুক না কেন, এ মৃত্যুও যে আসলে জীবনদেবতার অভিপ্রায়েই সংঘটিত লেখক সে-বিষয়ে আমাদের অবহিত ক'রেছেন।

নবম উদ্ধৃতিতে অছে সর্বজয়ার কথা । ঘর ছেড়ে সে পথে পা দিয়োছিলো মধুর ভবিষ্যতের আশায়। পথ তার কাছে ভাবী সুখ-সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবেই দেখা দিয়েছিলো। পথের দেবতার এও আর এক বিচিত্র লীলা। সর্বজয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি। পরাধীনতার পীড়ন-লাঞ্ছনের মধ্যে সে ইন্দির ঠাকরুণের দুঃখ-বেদনাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করেছে।

উপন্যাসের নামকরণের মাধ্যমে লেখক আলোচ্য উপন্যাসের মূল কথাটিই ব্যক্ত করেছেন। নিশ্চিন্দিপুরে এ পাঁচালী কাব্যের সূচনা ঘটলেও এর অভ্যন্তরে ধ্বনিত হয়েছে অনন্ত জীবনের মহাসংগীত। শত সহস্র বছর ধ'রে অসংখ্য জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, অনন্ত পথের পথিক যে মানুষ সেই মানুষের যাত্রার কথাই একাব্যে বলা হয়েছে. পথ-দেবতার প্রশস্তি গেয়েছেন বিভূতিভূষণ, 'পথের পাঁচালী' হয়ে উঠেছে পথের কাব্য। আর সেদিক থেকে এ নামকরণ যে সম্পূর্ণ সংগত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

Scanned with CamScanner